

বন্দাবন ভ্রমণ: ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’র উৎস সম্বন্ধে
লায়েক আলি খান

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/5_Layek-Ali-Khan.pdf

সারসংক্ষেপ: ‘চৈতন্যচরিতামৃত’এর কৃষ্ণদাস আর বন্দাবনের গোস্বামীদের আবাসস্থলকে ঘিরে বর্তমান প্রাবন্ধিকের জিজ্ঞাসাগুলির সংযোগে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছিল বন্দাবন ভ্রমণের ইচ্ছা। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের বন্দাবনের সঙ্গে একবিংশ শতকে সেই বন্দাবনে অবগাহনের নিভৃত আনন্দটুকু নিয়েই এবারে বন্দাবন ভ্রমণ। সেই বহুদর্শী উপলব্ধির ফসল এই প্রবন্ধ।

সূচক শব্দ: বন্দাবন, ভ্রমণ, বন্ধুবৎসল, বাঁকেবিহারী মন্দির, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড, বন্দাবনের ছয় গোস্বামী।

বিগত কয়েক বছর থেকে এম.এ. ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ পাঠের সময় থেকেই আমার মনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পীঠস্থান বন্দাবন দেখার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। ২০০৯/১০এর দিল্লী ও আগ্রা ভ্রমণের সঙ্গে অতি দ্রুত কয়েক ঘণ্টার জন্য আগ্রা থেকে বন্দাবন চলে এসেছিলাম। শুধু রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দেখে সন্ধ্যার পরেই আগ্রা ফিরে যেতে হয়েছিল। তাতে আমার কোনো কৌতূহলই চরিতার্থ হয়নি। কেননা ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ কৃষ্ণদাস আর বন্দাবনের গোস্বামীদের আবাসস্থলকে ঘিরে আমার জিজ্ঞাসাগুলির সঙ্গে এই জায়গাটির সংযোগ অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে। যদিও ষোড়শ শতকে প্রথমার্ধের বন্দাবনের সঙ্গে এই একবিংশ শতকের প্রথমার্ধের বন্দাবনের ভৌগোলিক সাযুজ্য অনুসন্ধান বাতুলতা মাত্র তবু কল্পনায় অবগাহনের নিভৃত আনন্দটুকু ভেতরে নিয়েই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম এবারে বন্দাবন ভ্রমণের।

শঙ্কর মজুমদার একদা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী ও সুহৃদ। তিনি শ্রীনিকেতনের দায়িত্বভার থেকে অবসর নিয়ে বিগত দু’বছর ধরে G.L.A. University, মথুরার ইকনমিকস বিভাগের বিভাগীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সুযোগটা এসে গেল আমার। শংকর ও তাঁর সহধর্মিণী সুদীপ্তা থাকেন বন্দাবনের ওমেজন কমপ্লেক্সে। তাঁদের কাছে আমার বন্দাবনে যাবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট করে প্রকাশ করি যে, সেখানে আমার মতন ভিন্নধর্মী, অধর্মী ও অবৈষম্য কী বন্দাবনের গোস্বামীদের আবাসভূমিতে প্রবেশাধিকার পেতে পারবে? বিষয়টা যথেষ্ট সেনসিটিভ বলে আমি সরাসরি এই প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু আমাকে থামিয়ে দিয়ে এই সুহৃদ দম্পতি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেন, এটা কোনো সমস্যা না। তুমি কবে আসবে বলো। আমরা সব জায়গা তোমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব।

এরপর দেরি না করে আমি ট্রেনের টিকিট বুক করি। এপ্রিল ২৪, ২০২৫। কলকাতা থেকে প্রতাপ এক্সপ্রেসে মথুরা পর্যন্ত। এর মধ্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঘটে যায় কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের নৃশংস ঘটনা। ২২ এপ্রিল ২০২৫ অজ্ঞাত আততায়ীদের গুলিতে পহেলগাঁও-এ ২৬ জন নিরীহ ভ্রমণার্থী খুন হন। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে বড়ো একটা ধাক্কা লাগে আবার। এই পরিস্থিতিতে শ্রুতার্থীরা বলতে থাকেন টিকিট ক্যানসেল করে দিতে। মথুরা বন্দাবনে এই সময়ে আমার যাওয়া বিবেচনার কাজ হবে না। সমস্যাটা শঙ্করকে জানালে তিনি অভয় দেন। এবং টিকিট বাতিল না করে চলে আসতে বলেন। ফলে যথা সময়ে মথুরা নামি। ২৫ তারিখ দুপুরের পরে।

ওমেজ কমপ্লেক্সের কুয়া কমপ্লেক্স আমার জন্য একটি ডবল বেডের ফ্ল্যাট চার দিনের জন্য বুক করা

ছিল। সুদীপ্তা সেই প্রথর রোদ্দুরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সেখানে পৌঁছানো মাত্র অটো থেকে নিয়ে গিয়ে সেখানে আমাদের তুলে দিলেন। ওখানে স্নান সেরে পাশেই তাঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারা হলো। বিকেলে ডিপার্টমেন্ট থেকে শঙ্কর ফিরে এলে আমরা গোলাম বন্দাবনের সবচেয়ে পুরাতন কৃষ্ণ মন্দিরে। এখানে মন্দিরটি ‘বাঁকেবিহারী’ মন্দির নামে পরিচিত। প্রচণ্ড ভিড় ভক্তদের। আবালবৃদ্ধ নরনারী সেখানে গেছেন তাঁর দর্শনে। এখানে সংস্কার আছে দু’বেলা এই দেব-মূর্তির পোশাক ও মন্দির চত্বরের সাজসজ্জা নতুন করে বদল করা হয়। প্রচুর শ্রম, শিল্পকলা ও জনবল লাগে এই কাজ নিখুঁত ভাবে, পরিপাটি করে সাজিয়ে নিতে।

এই ‘বাঁকেবিহারী’র মন্দিরে এসে শুনলাম, সুদীর্ঘ কাল এই ঠাকুরের বস্ত্র সজ্জার সেলাইয়ের কাজ করে আসছেন মুসলমান ধর্মের দর্জিরা। সাম্প্রতিক কালে একটি রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা নাকি মন্দিরের পাণ্ডাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। দাবি করেন, মুসলমান দর্জিদের থেকে এই সাজ কেনা যাবে না। কিন্তু সেবায়ত পাণ্ডাদের স্পষ্ট জবাব ছিল এই, বাঁকেজী এতকাল এদের হাতের পোশাকই পরে এসেছেন। এটা তাঁর পছন্দের বেশ। যদি তাঁর পছন্দ না হতো তিনি নিজেই জানাতেন। এই প্রথা বন্ধ করা যাবে না। শুনে স্তম্ভ হয়ে গোলাম। কোথায় কাশ্মীরে জঙ্গি হানাদার হিন্দুদের বেছে বেছে মেরেছে বলে পাশের বাড়ির হিন্দু বন্ধু মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে কথা বলছেন না যদিও খবর এই যে, সেই ২৬ জনের মধ্যে মুসলমানও আছেন এবং দুর্গত যাত্রীদের প্রতিরক্ষা ও পরিষেবার দায়িত্ব দরদের সঙ্গে মুসলমান কাশ্মীরিরাই করেছেন। অবশ্য এ ‘বাঁকেবিহারী’ মন্দিরের ঘটনা পহেলগাঁও ঘটনার অনেক আগের।

মন্দিরে সম্ভারতির ভিড় পেরিয়ে যখন ফিরছিলাম তখন এই ব্যাপারটা আমাকে মুগ্ধ করে ছিল যে, এই আমাদের ভারতবর্ষ। দেবালয়ে কোনো জাতিবিশেষ নেই। আসলে স্বার্থান্ধ মানুষই গড়ে তুলেছে বিভেদের প্রাচীর। শ্রীচৈতন্যের সময়ে গোড়বজা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণবীয় উদার ও বিভেদ বিরোধী নব্যবৈষ্ণব ধর্মের মানুষরা খুব নিরাপদ ছিলেন না স্মার্ত হিন্দুদের সামাজিক চাপে। তাই বুঝি শ্রীচৈতন্য চেয়েছিলেন বন্দাবনে গড়ে তুলতে একটি নিরাপদ উপনিবেশ। সেখানে এই সব নব্যবৈষ্ণব মেধাবীরা তাঁদের ধর্ম-সাধনা করতে পারেন বাধাহীন ভাবে। বলাবাহুল্য, ওই সময়ে বন্দাবন ছিল মুসলমান রাজাদের শাসনাধীন।

পরের দিন আমাদের দর্শনীয় জায়গাগুলির মধ্যে ছিল গোস্বামীদের সাধন ক্ষেত্র। আর দ্বাপরে কৃষ্ণলীলাক্ষেত্র বলে অধুনা চিহ্নিত যমুনা তীরবর্তী ঘাট ও মন্দিরগুলি। ‘ভাগবত’এ, ‘গীতগোবিন্দ’এ, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’এ যে বন্দাবনকে মানস নেত্রে দেখেছিলাম — এখন এখানে এসে মনে হলো না এলেই ভালো হতো। যমুনার নীলজল এখন কালো-বিষাক্ত। জলধারা ক্ষীণ। কুঞ্জছায়া বিলীন। যমুনার তীর ধরে গড়ে উঠছে ছোটো বড়ো মন্দির, আর নানান ধরনের দোকানপাট। পরিচ্ছন্নতার একান্ত অভাব। বন্দাবন শহরের যাবতীয় নোংরা ড্রেনের জল, আবর্জনা পড়ছে যমুনার প্রায় বুজে আসা বুকে। ভক্ত-ভ্রমণার্থীদের যমুনা বিহারের ব্যবসায়িক নৌকাগুলির সারি। এরই মধ্যে চিহ্নিত হচ্ছে রাখার বস্ত্রহরণের ঘাট। কালীয় দমনের কালীদহ ইত্যাদি। মন খারাপ হয়ে যায়।

এত হতাশার মধ্যেও আমার আশার আলো নেভেনি। আমি খবর পেলাম গোস্বামী রূপের সমাধি ও বাসস্থানের। রূপের একটি মূর্তি আছে সেখানে। একটি প্রাচীন মন্দির। ছোটো একটি পাঠকক্ষ আর ব্যবহারের জন্য একটি প্রাচীন কূপ। সম্ভবত ২৪ সেপ্টেম্বর ১৫৭৭এ এই কূপ ও উত্তরের পুকুর-সহ জমি জীব গোস্বামী ১৫ টাকায় কিনেছিলেন। এই সূত্রে বলে রাখি, রাখাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এলাকার জমি-পুকুর-কূপ-রাস্তা ১৫৪৬ থেকে ১৫৭৭এর মধ্যে মোট ৭টি দলিলে রঘুনাথ দাসের মারফৎ জীব গোস্বামী কিনেছিলেন। রাখাকুণ্ড থেকে প্রাপ্ত ফারসি দলিলের অনুবাদ থেকে আমি সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলোর বাংলা করে দিচ্ছি। নরেশচন্দ্র জানা মহাশয়, আমার প্রণম্য শিক্ষকের ‘বন্দাবনের ছয় গোস্বামী’ গ্রন্থে এই ইংরেজি দলিল সংকলিত।

দলিল	সম্পাদনের তারিখ	বিক্রেতা	ঠিকানা	ক্রেতা	মারফত
১	১৮.০৯.১৫৪৬	কাম্মা পিতা কনিরু সাল্‌ওয়া পিতা দোসা আধ্র পিতা মোকসা মাত্যা পিতা কালি কুজ্জ পিতা অশ্ব গোবিন্দ পিতা কুনকো	আলিখ আরিয়াল রাধাকুন্ড পরগণা	জীব গোস্বামী পিতা বল্লভ গোস্বামী	রঘুনাথ দাস
২	২৪.১০.১৫৪৬	ওই	ওই	ওই	ওই
৩	২৫.০১.১৫৫৩	ওই	ওই	ওই	ওই
৪	২৫.০৭.১৫৭৭	ওই	ওই	ওই	ওই
৫	৩০.০৮.১৫৭৭	ওই	ওই	ওই	ওই
৬	২৪.০৯.১৫৭৭	ওই	ওই	ওই	ওই
৭	২৫.০৯.১৫৭৭	ওই	ওই	ওই	ওই

এই সাতটা দলিলে যেসব প্লট বা এরিয়া কেনা হয়েছে তার বিবরণ আছে। এর মধ্যে ৩ নং এবং ৬ নং দলিলে দুটি কুয়োর উল্লেখ আছে। রাধাকুন্ড, কৃষ্ণকুন্ড সংলগ্ন রাস্তাঘাট গাছ (কারিল, নিম, হিডাবোর)-সহ প্রায় সমস্ত অঞ্চলটি কিনে নিচ্ছেন গোস্বামীরা। টাকা দিচ্ছেন রঘুনাথ দাস। টাকার অঙ্ক দলিল অনুযায়ী:

১. ৩০

২. ৩০

৩. ৮০

৪. ৬৪

৫. ২০

৬. ১৪

৭. ৪৪

মোট ২৮২ টাকা।

চৈতন্য তিরোধানের পরে পরেই (মানে ১৫৩৩এর কোনো সময়ে) রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনে চলে আসেন। বিত্তবান ঘরের সন্তান হয়েও রঘুনাথ চৈতন্যের টানে গৃহত্যাগ করে চলে আসেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের রহস্যমৃত্যুর পরে পরে আত্মঘাতী হবার বাসনা তিনি বৃন্দাবন চলে আসেন। নীলাচলে প্রথমাবধি শ্রীচৈতন্য তাঁর দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন স্বরূপ দামোদরের ওপর। আর বৃন্দাবনে তাঁর দেখাশোনার ভার পান কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ১৫৩৩এর ১৩ বছর পরে জীব গোস্বামীর নামে রাধাকুন্ড ও কৃষ্ণকুন্ডের সংলগ্ন সমস্ত জায়গা রঘুনাথই কিনে নিচ্ছেন। দলিলে শ্যামকুন্ড নেই, কৃষ্ণকুন্ডের উল্লেখ আছে। রূপ যে কূপ ব্যবহার করছেন সেই অঞ্চল ছিল দলিলে উল্লেখিত শরিকদের। রঘুনাথ দাস আসার আগে থেকে রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীরা তাহলে কী ওই এলাকাটিতে বিক্রেতাদের অনুমোদন ক্রমে বসবাস করছিলেন?

না অন্যত্র থাকতেন? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া আজ অসম্ভব।

দুপুরে আমরা আমন্ত্রিত ছিলাম সুদীপ্তার বন্ধু তথা ওই কমপ্লেক্সের এক পরিবারে। তাঁরা পাঞ্জাবের লোক। ধর্মে হিন্দু। তাঁরা ৯৫ বছরের মা’কে নিয়ে সপরিবারে থাকেন এখানে। ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার। অবসর নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রিয় জায়গায়। বন্দাবনে। তাঁর যুবক পুত্র, পুত্রবধূও একটি শিশু পুত্রকে নিয়ে আনন্দে আছেন। এই দম্পতি মায়ের সেবা যত্ন করত। ব্যাপারটি নতুন প্রজন্মের কাছে আদর্শ ও শিক্ষণীয় হতে পারে। আমাদের পরিচয় তাঁরা পেয়েছেন। তবুও আমার কাছ থেকে শ্রীচৈতন্য জীবনকথা শুনতে আগ্রহী তাঁরা। গৌড়ীয় মঠের শিষ্য যুবক ও তাঁর সঙ্গীরা পরম আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। বাংলা তাঁরা বোঝেন না। তাঁদের জন্য আমাকে ভাঙা হিন্দিতেই বলতে হলো প্রায় ৩ ঘণ্টা একটানা। বাঙালির অদম্ভ হিন্দি বক্তৃতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে আছে সম্ভবত লাহোরে মহিলাদের আসরে কবিগুরুর বক্তৃতা! অবশ্য এই বলার ক্ষেত্রে আমাকে নিরন্তর হিন্দি শব্দ জুগিয়ে গিয়েছেন পাশ থেকে আমার স্নেহভাজন বন্ধু সুদীপ্তা। এজন্য কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই আমার তাঁর কাছে। সবচেয়ে ভালো লাগলো এই পরিবারের আন্তরিক সশ্রদ্ধ আচরণ। একসঙ্গে বসে যত্ন করে দুপুরের খাবার গ্রহণ। ফ্ল্যাটের বাইরে রেখে আসা আমাদের সকলের জুতোগুলো কী পরম যত্নে বয়স্ক সেই গৃহস্থালী ঘরের ভেতরে তুলে রাখলেন। দেখে অপরাধবোধে আমার মাথা আপনি নত হয়ে এলো তাঁর কাছে। চা কফি খাই না বলায় তাঁদের পাঞ্জাবি-পানীয় বানিয়ে খাওয়ালেন দুধ বাদাম ইত্যাদি দিয়ে আশ্চর্য সুস্বাদু একটি পানীয়। তাঁদের ভাষায় ‘বান্ডাই’। অসহ গরমে ‘জুড়ালো দাহন জুড়ালো’ বলতে ইচ্ছে করছিল। আর সারাক্ষণ মনে করছিলাম এই মুহূর্তে ভারত জুড়ে যখন সাম্প্রদায়িক অশ্বকার আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে ভেঙে দিচ্ছে ঠিক তখনই এই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের অন্তঃপুরে কী উদার সুরে বাজছে মানবতার আনন্দ গান। শঙ্কর-সুদীপ্তাদের সৌজন্যে এই পাওনাটা কোনো জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফল বলে আমি লাভ করলাম মনে হলো।

পরের দিন আমরা যমুনাতীর ধরে অসংখ্য মন্দির ও আগেকার বিত্তবানদের পরিত্যক্ত ঘর বাড়ি দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলাম আর একটি আমার আগ্রহের জায়গায়। গোস্বামী সনাতনের সমাধিক্ষেত্রে। মধ্যযুগীয় পদ্ধতিতে ভূমি থেকে অনেকটা উপরে নির্মিত। সাদা রঙের সুউচ্চ একটি প্রত্যস্ত সৌধ। অনেকটা প্রশস্ত ও জন কোলাহল-বর্জিত এলাকা জুড়ে রয়েছে সৌধটি। সেবায়েত জানালেন কোনো লবণ ব্যবসায়ী সিন্ধী বা পাঞ্জাবি ভক্তের দানে নির্মিত এই সমাধি-মন্দির। এখানে দর্শনার্থীর ভিড় তেমন নেই। সেবায়েতের বর্ণনায় লেগে আছে সনাতনের অলৌকিক শক্তির প্রতি গভীর বিশ্বাসের আলো। রূপের চেয়ে বড়ো ছিলেন সনাতন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই। সনাতন রূপ এবং বল্লভ। অনেকে অনুমান করেন রূপ ও সনাতন নাম শ্রীচৈতন্যের দেওয়া। সম্ভবত তাঁদের পূর্বনাম অমর ও সন্তোষ। পিতা কুমারদেব গোস্বামী। মাতা রেবতীদেবী। কুমারদেবের পূর্বপুরুষ রূপেশ্বর কর্ণাট প্রদেশ থেকে এসেছিলেন বাংলায়। শ্রী জীবগোস্বামী ‘বৈষ্ণবতোষণীর’র শেষে জানিয়েছেন, সনাতন রূপ ও শ্রীবল্লভ ব্যতীত কুমারদেবের আরো পুত্র ছিল। তাঁরা শ্রীচৈতন্যের কৃপাভাজন ছিলেন না বলে চৈতন্যকাহিনিতে অনুল্লিখিত। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ রাজা হুসেন শাহ জানান: ‘তোমার বড়ো ভাই করে দস্যুব্যবহার’। এই সূত্র থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

রূপ ও সনাতন সংস্কৃত ও ফার্সিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। মালদহে মহানন্দা নদীর পূর্ব পূর্ব প্রান্তে ছিল তাঁদের মাতুলালয়। মাতামহ হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কার ছিলেন সুপণ্ডিত। এই দুই ভাই মাতুলালয়ে শিক্ষিত হন। এবং তাঁদের মেধা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে সুলতান হুসেন শাহ অমর = সনাতনকে ব্যক্তিগত সচিব (দেবীর খাস) এবং সন্তোষ = রূপকে অর্থমন্ত্রী (সাকর মল্লিক) পদে নিযুক্ত করেন। পুরন্দর খানের পরে প্রধান অমাত্য হন অমর অর্থাৎ সনাতন। রামকেলী গ্রামে তাঁদের পৈতৃক নিবাস। এবং রামকেলী গৌড় রাজসভা থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটারের মতো দূরত্ব। শ্রীচৈতন্য গোপনে এই দুই রাজকর্মচারীর কাছে যান এবং তিন জনের সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাৎ হয়। সম্ভবত রাজা হোসেন শাহকে আড়াল করে পত্রযোগে এই দুজনের চৈতন্য-সংযোগ ঘটেছিল। এই সময়ই হয় শ্রীচৈতন্য, নয় বুদ্ধিমান সনাতনেরা নিজেদের পিতৃদত্ত নাম বদল করে চিঠিপত্র চালাচালি করতেন। যাতে পত্র ধরা পড়লেও এই দুই শক্তিশালী রাজকর্মী সরাসরি ধরা না পড়েন — এরকম পরিকল্পনা থাকতে পারে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

যাই হোক সনাতনের এই সমাধিক্ষেত্রে এসে আমার মনে প্রথমাবধি একটি জিজ্ঞাসা কাজ ছিল — সনাতনের এই সমাধি ও সাধনক্ষেত্রটি রূপের থেকে এতটা দূরে কেন? তাহলে কী রূপ ও সনাতনের মধ্যে সম্পর্কের কোনো দূরত্ব তৈরি হয়েছিল? — উত্তর মেলে না কোথাও। জায়গার দলিল থেকে বোঝা যাচ্ছে রাধাকৃষ্ণ এলাকায় যেখানে রূপ ছিলেন সনাতনও সেখানে থাকতেন। কেননা জায়গাগুলি তাঁর নামে কিনে দিচ্ছেন রঘুনাথ দাস। রূপ কী প্রথমাবধি এখানে এসে থাকতেন? নাকি জায়গা কেনার পর নিজস্ব একটি সাধনক্ষেত্র স্থান করে নিয়েছিলেন। এর উত্তর আমি পাইনি।

বৃন্দাবন যাবার সময় ট্রেনে সহযাত্রী এক দম্পতীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সাধারণ পরিবারের বৈষ্ণব ভক্ত। গৌড়ীয় মঠের শিষ্য তাঁরা। তাঁরা জানিয়ে দিলেন শ্যামকুণ্ডের পাশে একটা গলিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও রঘুনাথ দাসের সমাধি আছে। আমি সেই গলিটার স্থান পাইনি। এই সংবাদ থেকে স্পষ্ট একথা যে জীব, রূপ এবং রঘুনাথরা যেখানে থাকতেন সনাতন সেখানে থাকতেন না। সনাতনের সমাধির পাশে অনেকটা নীচের দিকে আমি আলাদা একটি স্থূপের মতো নির্মাণ দেখতে পাই। কৌতূহল নিয়ে সেখানে নেমে গিয়ে দেখি সেই নির্মাণের ওপর লেখা আছে ‘গ্রন্থসমাধি’। ওপরে যে তদারকদার ছিলেন তিনি বাঙালি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এই গ্রন্থ-সমাধি ব্যাপারটা কী? তিনি নিস্পৃহ ভাবে তিনি জবাব দেন, বৃন্দাবনে গোস্বামীরা যেসব পুঁথি লিখেছিলেন সেই পবিত্র বস্তুগুলি সাধারণ মানুষ হাত দিলে অপবিত্র হয়ে যাবে। তাই সেগুলিকে এখানে সমাধি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আমাকে বিস্মিত করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে আমাকে সেই সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে দেয়। যে জিজ্ঞাসাটি দীর্ঘদিন যাবৎ আমি পোষণ করে এসেছি তা হলো — কৃষ্ণদাসের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ পুঁথিটির মূল আমাদের হস্তগত হয়নি। বিষ্ণুপুরের কাছে গ্রন্থটির পুঁথি দস্যুদের কবলিত হওয়ার সংবাদে কৃষ্ণদাসের মৃত্যু ইত্যাদি সংবাদ নিয়ে বিমানবিহারী মজুমদার দীর্ঘ আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তেই পৌঁছান না কেন আসলে বইটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। আমার রচিত ‘প্রসঙ্গ: বৈষ্ণব সাহিত্য’ গ্রন্থে এ বিষয়ে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

এখন এই ‘গ্রন্থসমাধি’ দৃশ্যটি আমার মনে সন্দেহ আরো গভীরভাবে উসকে দিল। আমার মনে এরকম প্রশ্ন জাগতে থাকে যে সনাতনের সমাধির কাছে এই গ্রন্থ সমাধির কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি কেন? এই সমাধির ভিতর কোন্ কোন্ গ্রন্থ সমাধিস্থ করা হয়েছে? কতদিন আগে এই সমাধি দেওয়া হয়েছে? কৃষ্ণদাসের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ লেখাকালে কবির অজান্তে, তাঁর একটা লেখা অনুলিপি করা হয়েছিল বলে সংবাদ আছে। কিন্তু পরবর্তীতে তা পাওয়া যায়নি। এই সমাধির মধ্যে সেই অনুলিপি নেই তো? দ্বিতীয়ত আর একটি পুঁথির থাকারও সম্ভাবনা। সেটি হলো ‘স্বরূপ দামোদরের কড়চা’। সংবাদ এই যে ১৫৩৩এ পুরীতে শ্রীচৈতন্যের রহস্যপূর্ণ অন্তর্ধানের পর তাঁর পার্শ্বদেবের মধ্যে একজনই কেবল জীবিত ছিলেন। তিনি রঘুনাথ দাস। যিনি আত্মঘাতী হবার জন্য পুণ্যার্থী বৃন্দাবনে চলে আসতে পেরেছিলেন। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ থেকে জানা যায়, পুরীতে শ্রীচৈতন্যের কাছে পৌঁছলে স্বরূপ দামোদরের দায়িত্বে তাঁকে রেখে ছিলেন শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য ও স্বরূপ দামোদরের সাহচর্যে তিনি নীলাচলে ১৬ বছর অতিবাহিত করেছেন। ১৫১৭ সালের মে-জুন পর্যন্ত তিনি নবদ্বীপে ছিলেন। এবং নিত্যানন্দের নির্দেশে তাঁর বৈষ্ণবমণ্ডলীর জন্য চিড়া-দধির মহোৎসবের খরচপত্র দিয়েছিলেন। যাইহোক চৈতন্য তিরোধানের পর স্বরূপ দামোদরের নাকি লাস পাওয়া গিয়েছিল পুরীর মন্দিরের ভিতরে। আর সেই স্বরূপ দামোদর রচিত গ্রন্থ ‘স্বরূপ দামোদরের কড়চা’ বইটিরও কোনো স্থান পাওয়া যায়নি। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মনে করেন বাজারে ‘স্বরূপ দামোদরের কড়চা’ নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত তা জাল।

আমাদের অনুমান, স্বরূপের স্নেহভাজন ও সঙ্গী রঘুনাথ ওই মূল পুঁথিটি বৃন্দাবনে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ রচনায় সরাসরি উল্লেখ করেছেন ‘স্বরূপ দামোদরের কড়চা’ অবলম্বনে এই অধ্যায় রচনা করেছেন তিনি। অতএব এই সূত্রে আমাদের মনে হয়, রঘুনাথ মারফৎ এই কড়চা কৃষ্ণদাসের ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। ১৫৭৭পর কোনো এক সময়

রঘুনাথের মৃত্যু হয়ে থাকলে এ পুঁথি কৃষ্ণদাসের দায়িত্বে ছিল। এবং কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পর তাঁর ‘চৈতন্যচরিতামৃত’র মূল পুঁথির অনুলিপি ও প্রাসঙ্গিক রেফারেন্সের সঙ্গে ‘স্বরূপ দামোদরের কড়চা’কেও এখানে সমাধিস্থ করা হয়। সম্ভবত যেসব পুঁথিতে পুরীতে জগন্নাথ ধামে চৈতন্যের তিরোধান প্রসঙ্গ বা তাঁর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র চক্রান্ত বিষয়ক কোনো তথ্য আছে এমন সব পুঁথিই এখানে প্রোথিত হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের নিত্যানন্দতত্ত্ব অতি বিশদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, চৈতন্যতত্ত্বের সমান্তরালে নিত্যানন্দতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বৃহৎ গ্রন্থ রচিত।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় রঘুনাথের সঙ্গে নিত্যানন্দের যোগাযোগ ঘটেছিল তবুও রঘুনাথ তাঁর ‘স্তুবাবলী’তে স্বরূপ, গোবিন্দর নাম করলেও নিত্যানন্দের নাম কোনো প্রসঙ্গে একবারও করেননি। ‘মুক্তাচরিতে’ জীব গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম করলেও নিত্যানন্দের নাম নেননি। ‘দানকেলিচিন্তামণি’তেও নিত্যানন্দ অনুল্লিখিত। অথচ কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে ‘নিত্যানন্দতত্ত্ব’ ‘চৈতন্যতত্ত্ব’র সমান্তরালে উল্লেখিত। এবং এই গ্রন্থের আদি লীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে যেখানে নিত্যানন্দতত্ত্ব নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে কৃষ্ণদাসের জীবনী উল্লেখে বলা হয়েছে নিত্যানন্দের মৃত্যুর পরের কোনো এক সময়ে তাঁর শিষ্য কৃষ্ণদাসের বাড়ির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কৃষ্ণদাসের দাদা নিত্যানন্দের নিন্দা করলে, ক্ষুণ্ণ শিষ্য সে গৃহ ত্যাগ করেন। এবং রাত্রে কৃষ্ণদাসকে স্বপ্নে নিত্যানন্দ এই গৃহ ত্যাগ করে বন্দাবন চলে যাবার পরামর্শ দেন।

সময়ের হিসাবে বিষয়টি বানানো গল্প বলে সন্দেহ হয় আমাদের। কেননা চৈতন্য তিরোধানের অন্তত দশ বছর পরে নিত্যানন্দের মৃত্যু হয়। তারপরে কোনো এক সময়ে কৃষ্ণদাসের বাড়ির মহোৎসবে উক্ত ঘটনা যদি ঘটে থাকে তাহলে চৈতন্য তিরোধানের পরে পরে রঘুনাথ দাস বন্দাবনে আত্মঘাতী হতে এলে রূপ, সনাতনেরা কৃষ্ণদাসকে যে তাঁর সেবার দিচ্ছেলেন একথা কেমন করে সত্য হয়! তাই আমাদের মনে হয় আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের নিত্যানন্দ তত্ত্ব কৃষ্ণদাস রচনা করেননি। এবং তাঁর মূল গ্রন্থেও একথা ছিল না। তাছাড়া এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদটিও কৃষ্ণদাস বিরচিত নয়। মানে ওই অংশটি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে ছিল চৈতন্য-অন্তর্ধানের সত্য সংবাদ যা রঘুনাথ দাস মারফৎ কৃষ্ণদাস জেনেছিলেন। কেননা চৈতন্যজীবনীর শেষ অংশ রচনার শপথ নিয়ে গ্রন্থ লিখলেও গ্রন্থের শেষে তার উল্লেখ না করে গ্রন্থ শেষ করা কৃষ্ণদাসের মতো দায়িত্ববান লেখকের পক্ষে অসম্ভব।

বিষ্ণুপুরের কাছে লুপ্ত পুঁথিটি আগাগোড়া সম্পাদিত হলেও আশঙ্কা ছিল বন্দাবনে থেকে যাওয়া মূলের অনুলিপিটা যদি প্রকাশিত হয় তবে এই নিত্যানন্দ তত্ত্ব সম্বলিত পুঁথির ফাঁকিটা অনাবৃত হয়ে পড়বে। অতএব সুপরিকল্পিত ভাবে কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পরবর্তীকালে কখনো অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে সনাতনের সমাধির পাশে চৈতন্যচরিতামৃতের অনুলিপি ও চৈতন্যলীলার অন্ত্যপর্বের সত্য ইতিহাসের সমর্থক অন্যান্য রেফারেন্স যুক্ত পুঁথির সমাধি দেওয়া হয়েছে। একাজ কারা কোন্ সময়ে করেছেন সেটা গবেষণার বিষয়। তবে জাহ্নবা দেবী যে বন্দাবনে খেতুরী উৎসবের শেষে গিয়েছিলেন সে সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব বন্দাবনে স্থিত নিত্যানন্দগণের কোনো কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত এই সিদ্ধান্তই নিরীহ প্রচারের মাধ্যমে কার্যকরী হয়েছিল যে ‘মহাজনদের রচিত পবিত্র পুঁথি অন্যদের হস্তস্পর্শে যাতে অপবিত্র না হয় তাই সেগুলিকে সমাহিত করা হোক।’ গ্রন্থ সংরক্ষণের এহেন যুক্তিকে সেদিন যারা সরল মনে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি আমাদের হতাশ ও অভিমানী নমস্কার জানানো ছাড়া আর কী জানাবার থাকতে পারে!

লেখক পরিচিতি: লায়েক আলি খান, প্রাক্তন অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন ‘কাজী নজরুল’ অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কবি।